উচ্চারণই আসল কথা

হীরেন চট্টোপাধ্যায়

নিয়মিত সময় অন্তর ঝোঁক পড়াটাই হল বাংলা ছন্দের প্রধান কথা। বাংলা ছন্দের বললাম দুটো কারণে। প্রথম কারণটা হল অন্যান্য ভাষার ছন্দের সঙ্গে বাংলা ছন্দের একটা তফাত তো আছে, সেইখানেই আছে ছন্দের প্রাণশক্তি, কাজেই তাকে চিনতে গেলে এই শক্তিটার কথা ভুললে চলবে না কখনোই। যদি কখনো কোনো মতবিরোধ দেখা দেয় তো শরণাপন্ন হতে হবে সেই মূল ব্যাপারটার। দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্যটা জানা থাকলে তাকে চেনার ক্ষেত্রে যেগুলো খুব প্রয়োজনীয় মনে হবে না, সেগুলো আমরা বাদ দিতেও পারব।

অন্যান্য ভাষার ছন্দ বলতে আমাদের চেনাজানা গণ্ডির মধ্যে দুটো ভাষাই আছে—সংস্কৃত আর ইংরেজি। সংস্কৃতভাষার উচ্চারণে লঘু অক্ষর এবং গুরু অক্ষরের তফাতটা মেনে চলা হয় অত্যন্ত ভালোভাবে। লঘু অক্ষর যতটা সময় নিয়ে উচ্চারণ করা হয়, গুরু অক্ষর উচ্চারণ করা হয় তার দু-গুণ সময় নিয়ে। কাজেই সংস্কৃত ছন্দের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে তার অক্ষরের বিন্যাস। বাংলায় সেই ব্যাপারটাই নেই, নেই বলেই এত বানান ভুল হয় আমাদের। যখন বলি 'নূপুর' তখন কখনোই উচ্চারণ করি না 'নূ-পুর', বা যখন বলি 'শারীরিক' তখন উচ্চারণটা 'শা—রী—রিক' হয় না। সংস্কৃত উচ্চারণে এই সুবিধাটা আছে বলেই কবি কালিদাস তাঁর 'রঘুবংশম্' কাব্যের শেষদিকে সীতা উদ্ধার করে রামচন্দ্র যখন আকাশপথে ফিরছেন, সমুদ্রের তটভূমির বিশাল ব্যাপ্তি বোঝাতে একের পর এক দীর্ঘস্বর ব্যবহার করে শ্লোক রচনা করেছেন। বাংলায় তার সঠিক উচ্চারণটা বুঝিয়ে দিচ্ছি, আগে মানেটা বলে নিই—'ওই দূরে, বহু দূরে, অনেক নীচে একেবারে ক্ষীণ রেখার মতো লবণাক্ত জলের গোলাকার যে তটভূমি দেখা যাচ্ছে, সেদিকে তাকাও। তমাল আর তালবনের মাথায় তটভূমি নীল, একেবারে গাঢ় নীল।' এরপর গোরুর গাড়ির চাকার একটা উপমা। শ্লোকটা দীর্ঘস্বর টেনে উচ্চারণ করে দেখাই—

'দূ—রা—দয়শ্চক্রনিভস্য তন্বী—তমা—লতা—লী—বনরা—জিনী—লা—।
আ—ভা—তি বে—লা—লবণা—ম্বুরা—শে—র্দ্ধা—রা—নিবদ্ধে—ব
কলঙ্করে—খা—।।'

বাংলায় এই হ্রস্ব-দীর্ঘভেদ উচ্চারণে নেই, সেটা কবি জীবনানন্দ দাশের হয়তো মনে ছিল না, থাকলে তাঁর একটা বিখ্যাত কবিতার এই অংশটা কেমন দাঁড়াত—কী বিশাল ব্যাপ্তি বোঝানো যেত, ভাবলেই অবাক হতে হয়। যে উচ্চারণটা সম্ভবত কবির কানে ছিল, সেটা এরকম হতেও পারে—

'চুল তা—র কবে—কা—র অন্ধকা—র বিদিশা—র নিশা—'

কিন্তু কিছু করার নেই, বাংলার স্বাভাবিক উচ্চারণে এটা আসে না।

এবারে ইংরেজি ছন্দের কথা। বাংলা ছন্দের মতো এক-এক ঝোঁকে ঠিক একই সময় ধরে উচ্চারণের দায়ও ইংরেজি কবিতার নেই, আর এইরকম ঝোঁক আলাদা করে কবিদের তৈরিও করতে হয় না। প্রত্যেকটি ইংরেজি শব্দে কোথায় ঝোঁক পড়বে তা নির্দিষ্ট হয়েই আছে, কবি শুধু সেই বিশেষ যে-জায়গায় ঝোঁক পড়াটা তাঁর পছন্দ সেইরকম শব্দ বেছে নেন। শব্দের প্রথমে ঝোঁক পড়ে এমন শব্দ যেমন ইংরেজি ভাষায় আছে—B'eautiful, P'ardon, C'lass প্রভৃতি যার উদাহরণ, তেমনি অন্য কোথাও ঝোঁক পড়ে এমন শব্দও বহু আছে, যথা—Del'icious, Imp'ortant, Syll'able প্রভৃতি। সুতরাং বাংলা ছন্দের সমস্যাটা ইংরেজির নেই। তো তাহলে, বাংলা ছন্দের মূল ব্যাপার যদি হয় ওই নিয়মিত সময় অন্তর ঝোঁক পড়াটাই—হ্রস্ব-দীর্ঘের নিয়ম যদি তার স্বরগুলির সম্বন্ধে প্রযোজ্য না হয়, শব্দের মাঝখানে থেকে ঝোঁক তৈরি করার কোনো সুযোগই যদি আমাদের না থাকে, তবে ধ্বনিতত্ত্ব নিয়ে সূক্ষ্ম আলোচনারও বিশেষ কোনো দরকার বোধ হয় বাংলায় ছন্দে নেই, বরং যেটা বেশি দরকার সেটা হল, ছন্দ যে শিখছে তাকে বেশি করে কানের ওপর নির্ভর করতে শেখানো।

কানের ওপর নির্ভর করতে গেলেই কিন্তু আমাদের উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো মনে রাখতে হবে। ভাষাতত্ত্বের কোনো পণ্ডিতমশাই যদি এসে বলেন, আরে উচ্চারণগুলোকে বিকৃত করছ কেন? তাহলে বলতে হবে পণ্ডিতমশাই, জন্ম থেকে ওইরকম উচ্চারণ করতেই আমরা শিখেছি। আর ঠিক যেমন করে উচ্চারণ করি তেমন করে না পড়লে ছন্দটাই যে ঠিক থাকবে না, কারণ বাংলা উচ্চারণটাই তো বাংলা ছন্দের বৈশিষ্ট্য। উচ্চারণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলো তাহলে মনে করে নিই একটু! না, একসঙ্গে রাশি রাশি বৈশিষ্ট্যের কথা বলে কোনো লাভ নেই, ছন্দ শিখতে গেলে যেগুলো না জানলেই নয়, সেগুলোই বলি :

এক।। বাংলা হরফে যেমন-যেমন লিখছ, উচ্চারণ করতে গিয়ে ঠিক তেমন-তেমন পড়ছ না, এমন দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ব্যাপারটা এমনিতে ভারি মজার, যেমন ধরো 'অ'-এর উচ্চারণ কিংবা 'এ'-র উচ্চারণ। লিখছ 'অতি', পড়ছ, 'ওতি'; লিখছ 'এক', পড়ছ 'অ্যাক', কিংবা 'অ্যাকটা' (একটা)—অথচ যেই লিখলে 'একটি', তখুনি 'এ'-র উচ্চারণটা ফিরে এল। আমরা অবশ্য সেই মজাটা এখন তেমন উপভোগ করব না, কারণ ছন্দের ক্ষেত্রে এগুলো বিশেষ কোনো সমস্যা তৈরি করে না; যেগুলো করে সেগুলোকেই চিনে নেবার চেষ্টা করব। সেগুলো কীরকম? যেমন ধরো—আহ্বান, রাক্ষস, উহ্য, লক্ষ্মী, মনোবাঞ্ছা, কঞ্চি, জ্ঞান, যোগ্য, উদ্যান, ব্যক্তি প্রভৃতি।

প্রথম শব্দটার উচ্চারণ কেউ কেউ ভুল করে সত্যি কথা, কিন্তু ওর ঠিক উচ্চারণটা হচ্ছে 'আওভান'। পরের শব্দটা হিন্দি ভাষায় ঠিক ঠিক উচ্চারণ হয়, কিন্তু আমরা উচ্চারণ করি 'রাক্‌খোস'। এইভাবে যদি বাকি শব্দগুলোর উচ্চারণগুলো লিখি, তাহলে সেগুলো হবে যথাক্রমে—উজ্‌ঝো, লোক্‌খি, মনোবান্‌ছা, কোন্‌চি, গ্যান, যোগ্‌গো, উদ্‌দান, বেক্‌তি।

দুই।। বাংলায় বিসর্গ (ঃ)-এর উচ্চারণটা বেশির ভাগ সময়ই বিসর্গের পরে যে ব্যঞ্জনবর্ণটা

আছে, ঠিক তার মতো দাঁড়ায়, মানে আমরা সেইরকম উচ্চারণই করি আর কি। করি কি না দেখো—

লিখি	পড়ি
দুঃসাহস	দুস্‌সাহস
দুঃখ	দুক্‌খ (ক্-তো খ-এর মতোই প্রায়)
নিঃশব্দ	নিশ্‌শব্দ
নিঃসন্দেহ	নিস্‌সন্দেহ

তিন।। যে-কোনো বাংলা শব্দে শেষের অক্ষরটা যদি অ-কারান্ত হয়, আমরা সেটা প্রায়ই অ-কারান্ত হিসেবে উচ্চারণ করি না, করি হসন্ত দিয়ে। যেমন—'যেমন' (উচ্চারণ করি য্যামন্), 'মন' (উচ্চারণ মোন্), দিন (উচ্চারণ দিন্), রাত (উচ্চারণ রাত্)।

ব্যাপারটা আরও মজার হয় যখন তিন অক্ষরের শব্দে তিনটেই থাকে অ-কার। তখন প্রথম অ-টার উচ্চারণ হয় 'অ'-এরই মতো, দ্বিতীয়টার উচ্চারণ হয় 'ও'-কার, আর তৃতীয়টার উচ্চারণ হয়ই না। কীরকম? দেখো—

লিখি	পড়ি
যখন	যখোন্
স্বপন	স্বপোন্
রতন	রতোন্
গঠন	গঠোন্
সকল	সকোল্
কথক	কথোক্
সরস	সরোস্

চার।। শব্দের শেষে যদি অ-কারান্ত অক্ষর থাকে তবে প্রায়ই সেটা উচ্চারণ হয় না, এটা তো আমরা দেখলামই, কিন্তু সেই সঙ্গে আর একটা মজার ব্যাপারও লক্ষ করতে হবে—সেই শব্দটার সঙ্গেই যদি আর-একটা শব্দ যোগ করার ফলে সেটা সমাসবদ্ধ পদ হয়ে যায়, তখন কিন্তু ওই অ-কারটার উচ্চারণ হবে, আর সেটা হসন্ত হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে না। দেখাই যাক ব্যাপারটা কেমন।

এমনিতে 'জন' শব্দটা আমরা উচ্চারণ করছি—'জন্'। এবার 'জন' এর সঙ্গে একটা 'গণ' যোগ করে তৈরি করো আর-একটা শব্দ 'জনগণ'। তখন উচ্চারণ করব এটা—জনোগণ্।

আবার আলাদা করে 'গণ' শব্দটাকে দেখা যাক, উচ্চারণ 'গণ্'। কিন্তু এর সঙ্গে যোগ করি 'সংগীত', শব্দটা হল—গণসংগীত, উচ্চারণ—'গণোসংগীত'।

পাঁচ।। আমাদের শরীরের মধ্যে সম্ভবত সবচেয়ে অলস হচ্ছে জিভ, ফাঁকি দেবার সুযোগ পেলে আর ছাড়তে চায় না। একটা শব্দে যদি স্বরধ্বনির পরই একটা যুক্তব্যঞ্জন থাকে, জিভ

অনেক সময়ই সেটা একেবারে উচ্চারণ করতে পারে না, সেই যুক্তব্যঞ্জনের প্রথমটাকে বাড়তি উচ্চারণ করে একটু বিশ্রাম নেয়, তারপর যুক্তব্যঞ্জনটা উচ্চারণ করে। কথাটা স্পষ্ট হবে দু—একটা উদাহরণ শোনালে। ধরা যাক, শব্দটা 'বিক্রয়'—প্রথমে একটা হ্রস্ব-ই আছে, তারপরই যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ + র্'। জিভ করে কী, ওই প্রথম ব্যঞ্জন আর একটা আমদানি করে, সেখানে গিয়ে একটু জিরোয়, তারপর শব্দটা উচ্চারণ করে—বিক্‌ক্রয়। ঠিক এই ভাবেই 'অপ্রিয়', 'অভিনেত্রী', 'অগ্রণী', শব্দগুলিকে আমরা উচ্চারণ করি যথাক্রমে 'অপ্‌প্রিয়', 'অভিনেত্‌ত্রী', 'অগ্‌গ্রণী' প্রভৃতি।

ছয়।। 'ই' আর 'ও'-কারকে নিয়ে মাঝে মাঝে খুব ঝামেলা বাধান তাঁরা, যাঁরা কানকে একটু হেয় করে দেখেন চোখের চেয়ে। ধরা যাক লেখা আছে 'কোনোদিনই' বা 'ঠিকঠিকই', তাঁরা অক্ষর বেড়ে গেলে মনে করে ছন্দভঙ্গের ভয় করেন। আসলে এদের উচ্চারণ তো হবে 'কোনোদিনি' বা 'ঠিকঠিকি'। কবিতার লাইন হিসেবে লিখে দেখো—

> বলেছিস ঠিকঠিকই,
> তাই ডাকে টিকটিকি।

সেইরকম 'কোনোদিনও' উচ্চারণে 'কোনোদিনো'-ই হয়ে যায়। কাজেই কী শুনলাম সেটাই হল আসল ব্যাপার, কী পড়লাম সে নিয়ে বেশি মাথা ঘামাবার দরকার নেই।